সাধক ও সাধনা

ক্ষিতিমোহন সেন

সম্পাদনা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

কিন্তু ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে ; সেইটি তার অন্তরের জিনিস। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয় এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।

— রবীন্দ্রনাথ

(ভূমিকা : ক্ষিতিমোহন সেনের
ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা)

ভূমিকা

জ্ঞানে কর্মে মনস্বিতায় সহৃদয় ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল মানুষ ছিলেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০)। চল্লিশ বছরের বেশি পার হয়ে গেছে তাঁর মৃত্যুর পরে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি কালের নিয়মে বিস্মৃতির ছোপ ধরে তাঁর মূর্তি একেবারে ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এখনও দেখি অনেকেরই স্মৃতি তাঁকে ঘিরে যথেষ্ট সজীব এবং বর্ণময়। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি ১৯০৮ সালে যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপনা করতে আসেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় আঠাশ। সেই থেকে তাঁর আশি বছরের আয়ুষ্কাল এইখানেই কেটেছিল। রবীন্দ্রনাথের নবরত্নসভার অন্যতম জ্যোতিষ্ক তিনি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া অভিধায় 'এ্যাকা নবরতন ক্ষিতিমোহন'। যখন রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁকে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিলেন, তিনি তখন কাশ্মীর সন্নিহিত দেশীয় রাজ্য চম্বায় কর্মরত। তিনি সেখানকার শিক্ষাসচিব বা সভাপণ্ডিত। সে সময় কবির সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকটি চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল। তারই একটিতে ১৯ ফাল্গুন ১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত সঙ্কোচ ও চিন্তা দূর করিয়া দিয়া ধরা দিবেন — আপনি না আসিয়া কোন মতেই থাকিতে পারিবেন না—আপনার পর্বত হইতে আপনি নদীর মত এখানে ছুটিয়া আসিবেন।'

ঠিক আগের দিন, ১৮ ফাল্গুন ক্ষিতিমোহন যে চিঠিটা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, তাতে তিনিও এই নদীর উপমাটাই ব্যবহার করেছিলেন। কত নদনদী পাহাড়ের বাধা ডিঙিয়ে তাদের নির্মল জলধারা নিয়ে নেমে আসছে, মলিন দেশের সেবা করে মলিন হয়ে নিজেদের সমুদ্রের জলরাশিতে উৎসর্গ করতে চলেছে, আর 'আমিই কেবল ইহাদের তীরে পাষাণের ন্যায় এই সেবাব্রতের মূকসাক্ষী মাত্র হইয়া রহিলাম।' তারপর কয়েক দিন পরে ২৬ ফাল্গুন কবির ১৯ ফাল্গুনের চিঠির উত্তর দিতে গিয়েও আবার নদীর প্রসঙ্গটা টেনে আনলেন। তখন তাঁর মন স্থির, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজ গ্রহণ করবেন। লিখলেন, 'আজ আমার চিত্ত পরিপূর্ণ, নদনদীর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। নদী যায় সেবা করিয়া মলিন হইতে, আমি যাইতেছি পবিত্র হইতে। .... হিমালয়ে আমি পথ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পাগলের মত বনে বনে ফিরিয়াছি।'

সত্যই যেন ক্ষিতিমোহনের জীবনধারা নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে গেছে শান্তিনিকেতনের উপর দিয়ে দীর্ঘ বাহান্ন বছর ধরে। রাবীন্দ্রিক শান্তিনিকেতনে বাস করে প্রাণরসধারার নিত্য বর্ষণে নিজে সঞ্জীবিত হয়েছেন যেমন তেমনই সতত আপন প্রাণরসে নিত্য প্লাবিত ও উজ্জীবিত করেছেন শান্তিনিকেতনকে। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে তাঁর পাণ্ডিত্যের অধ্যাপনার বাগ্মিতার এবং হৃদয়গ্রাহী আলাপচারিতার খ্যাতি ছড়িয়েছিল বহু দূর। অবসরগ্রহণেরও পরে কিছুদিনের জন্য তাঁকে এই বিদ্যায়তনের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করতে হয় বটে, নাহলে রবীন্দ্রোত্তর কালের শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে আচার্যের পদমর্যাদায় তিনি কোনোদিন ভূষিত হননি। আচার্যপদে একে একে বৃত হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নায়ডু, জওহরলাল নেহরুর মতো সুবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনে আচার্যের আসনে বাস্তবিক যাঁর অবিচলিত অধিষ্ঠান সবার মনেই

স্বতঃগ্রাহ্য, তিনি ক্ষিতিমোহন সেন। খুব কম দিন নয়, রবীন্দ্রতিরোধানের পর থেকে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর।

পৈত্রিক নিবাস পূর্ববঙ্গে হলেও ক্ষিতিমোহন সেন মানুষ হয়েছিলেন কাশীতে। মুখ্যত প্রাচ্যধারায় পড়াশুনা, টোলে চতুষ্পাঠীতে শ্রুতি-স্মৃতি-সাহিত্য-ব্যাকরণ-অলংকার প্রভৃতি অধ্যয়ন করে ব্যুৎপন্ন হয়ে ওঠেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও আয়ত্ত করেন অল্পবয়সেই। এর পিছনে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাবটুকু টের পাওয়া যায়। বিদ্বান বংশে জন্ম ক্ষিতিমোহনের, পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ নাম-করা কবিরাজ ছিলেন। এরপরে তিনি কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রম সম্পূর্ণ করে যথাবিহিত উপাধি অর্জন করেন। হয়তো সেইজন্য প্রথাবদ্ধ ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়ে তাঁর মন বিকশিত হলেও সেই গণ্ডির সীমায় সে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। সহজাত ছিল তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ স্বচ্ছচিন্তার অধিকার, জ্ঞানচর্চার ব্যাপ্তিও বড় সামান্য ছিল না। তবে পাণ্ডিত্য যতই থাক তিনি পণ্ডিত হতে চান নি। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর সৃষ্টিছাড়া মন আপন খেয়ালে তার নিজস্ব পথের সন্ধান পেতে চেয়েছিল।

বাল্যকাল থেকে খোলা চোখে খোলা মনে পথ চলেছেন, বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে ঝুলি ভরেছেন। জন্ম-পথিক তিনি। দেশের নানা দিকে মুসাফিরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন নামমাত্র পুঁজি নিয়ে, কখনও বা আক্ষরিক অর্থে খালি হাতে। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে মিশেছেন, জেনেছেন তাদের। এমনি করে এদেশের মানস-সম্পদ সম্পর্কে তাঁর যেমন গভীর জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল, তেমন জ্ঞানার্জনের সুযোগ পুথির পাঠ তাঁকে দিতে পারত না। কাশীর মতো তীর্থে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মানুষ আসেন, আসেন সাধুমহাত্মারা। ক্ষিতিমোহন সেনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ছিল এইসব সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি। তাঁদের সঙ্গলাভ করতে, তাঁদের কথা শুনতে, কাশীপরিক্রমায় তাঁদের সঙ্গী হতে খুব ভালোবাসতেন। এঁদের কণ্ঠে নানক-কবীর দাদূর ভজন শুনে মুগ্ধ হতেন। কাশীতে মন্দিরের শেষ নেই, শেষ নেই মঠ-আখড়া-আশ্রমের। অবাধ যাতায়াত ছিল তাঁর সেসব জায়গায়। ধর্ম-আলোচনা শাস্ত্র- ব্যাখ্যা কীর্তন চণ্ডীর গান যেমন শুনতেন, তেমন শুনতেন সন্তদোঁহা। বাউলগানের সঙ্গেও পরিচয় এই কাশীতেই। ক্রমশ এদেশে নিরক্ষরস্তরের মধ্যে নিহিত সুচিরকালবাহিত শাস্ত্রাচার- বর্জিত ব্রাত্যধর্মের আশ্চর্য ঐশ্বর্যের গোপন ভাণ্ডারদ্বার খুলে গেছে তাঁর সামনে। এতদিন গান শুনতেন, এবার শুরু হল গান খোঁজা। সন্তবাণী সংগ্রহের অমোঘ নেশায় পেয়ে বসল তাঁকে। তাঁর সমকালীন সত্যাশ্রয়ী সন্তসাধকদের সন্ধানেও কম ঘোরেননি তিনি, অনেক দুর্লভ খাঁটি সাধুর সঙ্গলাভও করেছেন। এই সব অপাঙ্‌ক্তেয় শাস্ত্রবিবর্জিতপন্থ সাধকদের হাতে-জ্বালা দীপের আলোয় আলোকিত হয়েছে তাঁর আত্মানুসন্ধানের পথ।

শাস্ত্রাধ্যয়ন তাঁকে গ্রন্থকীট করে নি। আবার অপুথিয়া পথের টানে ঘর ছেড়েছেন বটে, তাবলে বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরে স্বভাবের লোক তিনি নন। পথে পথে যেমন ফিরেছেন, ঘরের টানেও তেমন নিবিড় মমতায় বাঁধা পড়েছেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর নাড়ির টান, দেশের মাটির সঙ্গে তাঁর অস্তিত্ব জড়ানো। সেখান থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করে তাঁর মন মুক্ত আকাশে ডানা মেলেছে এবং আধুনিক যুগ-প্রবর্তনাকেও সশ্রদ্ধ আগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছে।

চারপাশ থেকে যা পেয়েছেন, স্বভাবের পাচক-রসে তাকে জারিত করে আপন করে নিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে যখন এলেন তখনই বহু দর্শনে-শ্রবণে-অধ্যয়নে-পর্যটনে ক্ষিতিমোহন যথেষ্ট পরিণত। তবু তখনও তো অনেক বাকি, জীবনের পথ অনাগত কালের দিকে বহুদূর প্রসারিত। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আগেই মন কেড়েছিল, এবার শান্তিনিকেতনে এসে সেই কবি ও তাঁর সৃষ্টির নিকট-সান্নিধ্য থেকে তাঁর শ্রদ্ধাবনত রসময়

চিত্ত অজস্র মণিমুক্তা আহরণ করেছে। প্রায় বত্রিশ বছর রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছেন, শিষ্যের আনুগত্য নিয়ে গুরুর মতো মেনেছেন তাঁকে। বলতেন, 'দেখ, আমরা ছিলাম মাটির তাল, গুরুদেব আমাদের হাতে ধরে গড়েপিটে তৈরি করে নিয়েছেন।' অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ কথার উল্লেখ করে বলেছেন, ক্ষিতিমোহন সেন মাটির তাল নন, সোনার তাল। 'রবীন্দ্রপ্রতিভার বহ্নিস্পর্শে সে স্বর্ণাভা উজ্জ্বলতর হয়েছে' ঠিকই, এবং এতেও সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথই তাঁর প্রতিভা আবিষ্কার করে তাঁকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। তবে হীরেন্দ্রনাথের মতে ক্ষিতিমোহন সেনের মতো মানুষের প্রতিভার স্ফুরণ যে-কোনো স্থানে যে-কোনো অবস্থাতেই হতে পারত।

পরিচয় হতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে সেই মানুষটিকে আবিষ্কার করলেন যিনি কিশোর বয়স থেকে মধ্যযুগীয় সন্তবাণী ও সাধনার চর্চা করে আসছেন, বাউলদের বিস্তর খবরাখবর যাঁর নখদর্পণে, যিনি ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্রাত্যসাধনার মতো বিপরীতধর্মী বিষয়কে অনায়াসে মেলাতে পেরেছেন, লোকধর্ম ও সংস্কৃতির গভীরে যাঁর মন প্রবিষ্ট হয়েছে। দেশের এইসব অসামান্য ভাবসম্পদ গ্রন্থাকারে সংকলনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুপ্রাণিত করলেন। ক্ষিতিমোহনের লেখক-জীবনের সূচনায় কবির এই আবিষ্কারের অভিঘাতটি আছে। এতদিন যা ছিল তাঁর একান্ত চর্চার বিষয়, এখন রবীন্দ্রনাথের আদেশে দেশের সেই লোকধর্ম ও দর্শনের অন্তহীন ঐশ্বর্য সংগ্রহ ও সংকলনে তিনি মন দিলেন।

ক্ষিতিমোহনের অধিকাংশ গ্রন্থেরই মূল এবং প্রত্যক্ষ প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র মধ্যযুগের সন্তদের জীবনী ও সানুবাদ বাণীসংগ্রহেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তাঁর কাজ, আরও বিবিধ বিষয় এসেছে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের বৃত্তে। তাঁর বইগুলির নাম উল্লেখ করলে তাঁর গবেষণাকর্মের বিষয়বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাবে : কবীর ১-৪ খণ্ড (১৯১০-১১); ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা (১৯৩০);দাদূ (১৯৩৫); ভারতের সংস্কৃতি (১৯৪৩); বাংলার সাধনা (১৯৪৫); জাতিভেদ (১৯৪৭); হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ (১৯৪৭); প্রাচীন ভারতে নারী (১৯৫০); ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা (১৯৫০); যুগগুরু রামমোহন (১৯৫২); বলাকা কাব্য পরিক্রমা (১৯৫২); বাংলার বাউল (১৯৫৪); চিন্ময় বঙ্গ (১৯৫৭)। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় সীমা ও অসীম (১৯৮১); রামমোহন ও ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনা (১৯৮২); বেদোত্তর সঙ্গীত (১৯৮৪)। ক্ষিতিমোহনের ইংরেজি গ্রন্থ দুটি : Medieval Mysticism of India (১৯৩৬); Hinduism (১৯৬১)। শেষ বইটি তিনি দেখে যাননি।

সাময়িক পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। বহু বিচিত্র তার বিষয়বস্তু। এর মধ্যে কয়েকটি তাঁর কোনো-না-কোনো গ্রন্থ-পরিকল্পনার অঙ্গ এবং সেই অনুসারে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তুলনায় তাঁর অগ্রন্থিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক বেশি। ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনী লেখার সময়ই তাঁর এইসব প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে কয়েকখণ্ডে সংকলন করার ইচ্ছা মনে আসে।

জীবনীর কাজ যখন আরম্ভ করি তখনই বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ পেয়েছিলাম ক্ষিতিমোহন সেনের পুত্র স্বর্গত ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন ও কন্যা শ্রীমতী অমিতা সেনের সৌজন্যে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার থেকে অনেক প্রবন্ধ সংগ্রহ করা গেছে। কয়েকটি প্রবন্ধর সন্ধান দিয়ে শ্রীঅশোক উপাধ্যায় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সংগ্রহ-ব্যাপারে আমার সব চেয়ে বড়ো সহায় আমার ছাত্র শ্রী অভীককুমার দে। চৈতন্য লাইব্রেরি, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার থেকেও তিনি প্রবন্ধ সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য না পেলে এ সব প্রবন্ধ পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হত। এই প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশের উদ্যোগে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি।

সব প্রবন্ধ এখনও সংগ্রহ করা যায়নি। 'সব' কথাটাও আপেক্ষিক। অর্থাৎ যতগুলি প্রবন্ধের সন্ধান পেয়ে ক্ষিতিমোহন সেনের রচনাপঞ্জী প্রণয়ন করা ও তা তাঁর জীবনীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল, তার মধ্যে সব। এর-মধ্যে এখনও যা বাকি আছে, আশা করি, সেগুলি সবই সংগ্রহ করে নিতে পারব। তবে আমাদের তালিকার বাইরে হয়তো তাঁর কোনো কোনো প্রবন্ধ কোনো পত্রিকায় রয়ে গেছে, এমন আশংকা মন থেকে যায় না। যেমন, সেকালের পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বলেই তো মনে হয়। সে সব আমাদের নাগালের বাইরে থেকে গেল।

যে-সব প্রবন্ধ ক্ষিতিমোহন সেনের গ্রন্থভুক্ত হয়েছে, সব না হোক, তারও কয়েকটি এই প্রবন্ধ-সংগ্রহে স্থান পাবে। আমাদের ধারণা, তার দ্বারা লেখকের অন্বেষণ চিন্তা ও চর্চার ক্ষেত্রসীমার ধারণা অন্তত কিছুটা সম্পূর্ণতা পেতে পারবে পাঠক-মনে। তাছাড়া তাঁর অনেক বই এখন আর সুলভ নয়, মুদ্রণ নিঃশেষিত। অবশ্য অনতি-সাম্প্রতিক কালে বিশ্বভারতী তাঁর 'দাদূ' এবং 'প্রাচীন ভারতে নারী' পুনর্মুদ্রিত করেছেন। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে চার খণ্ড 'কবীর' একত্রে একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১০-১১ সালের পরে এই দ্বিতীয়বার বইটি মুদ্রিত হল।

এমন অনেক প্রবন্ধ তাঁর আছে যা তাঁর কোনো গ্রন্থের পরিপূরক বলতে পারি। চার খণ্ড পদসংকলন ছাড়া সন্ত কবীর সম্পর্কে আর তাঁর কোনো গ্রন্থ নেই। 'দাদূ' গ্রন্থে যেভাবে ক্ষিতিমোহন সেন সাধক দাদূর প্রামাণ্য জীবনী এবং তাঁর পদগুলির অনুবাদসহ সন্নিবেশ করেছেন, সেইভাবেই তাঁর কবীর প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক এবং সঙ্গত ছিল। অথচ তা হয় নি। তবে তাঁর কবীরচর্চার মূল্যবান নিদর্শন আছে 'কবীর', 'ভক্তকবি কবীর', 'যোগী কবীর'-এর মতো প্রবন্ধে। অবশ্য কবীরদাস বা তাঁর দোঁহার উল্লেখ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক্ষিতিমোহনের আরও বহু প্রবন্ধেই প্রসঙ্গত এসেছে এবং সে-কথা বেদমন্ত্র থেকে বাউলগান ইত্যাদি আরও বহুবিধ বিষয় সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনধারা অনুসরণ করলে এ কথাটা নজরে আসে যে তিনি সন্ত ও বাউলদের সম্পর্কে যে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণা করেছেন, তার সামান্য অংশই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। এমনকি সন্ত রবিদাস সম্পর্কে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে জানা গেলেও বই প্রকাশিত হয়নি। তাঁর সংগৃহীত সাধিকা মীরাবাঈয়ের গানগুলি তিনি ছাপবার জন্য পাণ্ডুলিপি আকারে সাজানোর কাজও শেষ করেছিলেন, তাঁর নিজের লেখা থেকেই এ সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বই বেরোয়নি। কেন বেরোয়নি সে প্রশ্ন ভিন্ন, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর জীবনীগ্রন্থে সাধ্যমতো তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি সন্ত রবিদাস, মীরা বাঈ এবং আরও কোনো কোনো খ্যাত বা অখ্যাত সাধকের কিছু কিছু বাণীর ব্যাখ্যা সহ তাঁদের জীবনসাধনার পরিচয় দিয়েছেন, সেগুলিও অমূল্য। তাঁর বাউল গানের বিপুল সংগ্রহেরও অতি অল্প প্রকাশ্যে এসেছে। বই আকারে তাঁর 'বাংলার বাউল' এখনও পাওয়া যায়। সেজন্য আমরা এই প্রবন্ধসংগ্রহে তাঁর বাউলচর্চার পরিচয় বিশেষ দিতে পারব না, অন্তত এই প্রথম খণ্ডে।

ক্ষিতিমোহন সেনের যে-সব প্রবন্ধ তাঁর কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়েছে, তার পত্রিকাপাঠের সঙ্গে গ্রন্থপাঠ মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে। সন্তদোঁহা বা বিদেশী শব্দ বা অন্য কোনো উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উভয় পাঠে পার্থক্য আছে দেখা গেলে আমরা গ্রন্থপাঠ গ্রহণ করেছি। কিন্তু যেখানে লেখক তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থে স্থান দেবার সময় পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের কিছু সম্পাদনা করেছেন, হয়তো কোথাও কোনো বাক্য যুক্ত বা বর্জিত হয়েছে, সেখানে আমরা পত্রিকাপাঠ যথাযথ রাখাই সমীচীন বোধ করেছি। রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থের অনেক পুরোনো সংস্করণ ব্যবহৃত

হয়েছে এইসব প্রবন্ধে। ফলে কবিতার সংখ্যা বা পৃষ্ঠাসংখ্যা বিশ্বভারতীর পরবর্তী সংস্করণের সঙ্গে অনেক সময় মেলে না। *বলাকার* কবিতার সংখ্যা ব্যবহার করেন না ক্ষিতিমোহন সেন। ব্যবহার করেন শিরোনাম। উদ্ধৃতিগুলির সূত্রনির্দেশে আমরা তাঁরই রীতি শুধু রবীন্দ্রকাব্য কেন, সর্বক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রেখেছি।

দু-একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রবন্ধে একই সন্তবাণীর উদ্ধৃতিতে ঈষৎ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আমরা যেটি যেমন আছে তাই রেখেছি। বৈষ্ণব পদের উদ্ধৃতি বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্য/সংসদ বৈশাখ ১৩৬৮)-র সঙ্গে মিলিয়ে মুদ্রণপ্রমাদগুলি সংশোধনের চেষ্টা করেছি।

প্রবন্ধকার যে-সব পাদটীকা দিয়েছেন সেগুলি স্বস্থানে অপরিবর্তিত রাখা হল। যেখানে প্রয়োজনে কোনো পাদটীকা যোগ করতে হয়েছে, টীকা শেষে 'স'—এই শব্দটি সংযোগ করে সেটিকে প্রবন্ধকারের পাদটীকা থেকে পৃথক করতে চেয়েছি। পাঠক বুঝবেন সেটি সম্পাদক-সংযোজিত টীকা।

কোথাও শ্লোক বা অন্য উদ্ধৃতাংশের মধ্যে বর্জনচিহ্ন '.....' থাকলে জানতে হবে তা মূলানুগ। আমরা স্বেচ্ছায় কিছুই বর্জন করিনি। তবে কোথাও কোথাও জীর্ণতাবশত প্রবন্ধের কোনো অংশের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না হয়ে থাকলে আমরা সেখানে [....] ব্যবহার করেছি।

'মীরার জীবনসংগীত' নামে একটি প্রবন্ধ অনিবার্য কারণে কালানুক্রমিক বিন্যাসের বাইরে রয়ে গেল। সব শেষে সেটি স্থান পেয়েছে। এই ত্রুটি মার্জনীয়।

এই প্রবন্ধসংকলন প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে পুনশ্চ-র স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় শ্রী সন্দীপ নায়ক আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি, অনুভব করেছি নির্ভর করবার মতোই মানুষ তিনি। গতানুগতিক প্রথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই না তাঁর প্রতি। তাঁর অশেষ কল্যাণ কামনা করি।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

কলকাতা
২৫/০৫/২০০২

সূচীপত্র

রচনা		পৃষ্ঠাসংখ্যা
কবীরের রামায়ণ	.....	১৫
দাদূ	.....	১৮
কবি	.....	৩৪
মহবুবীধর্ম	.....	৩৬
মালিক মহম্মদ জায়সী	.....	৩৯
কবীরের প্রেমসাধনা	.....	৪৪
কবীর	.....	৫৫
পলটূ দাস	.....	৭৬
দাদূর সেবা-যোগ	.....	৮০
ভক্ত কবীরের বসন্ত-উৎসব	.....	৮৫
জৈন মরমী আনন্দঘন	.....	৯০
ঝাড়খণ্ডে ভক্তি-ধর্মের প্রভাব	.....	১০৫
কহাঁ হৈ অস দাবা	.....	১০৭
মধ্যযুগে রাজস্থান ও বাংলার মধ্যে সাধনার সম্বন্ধ	.....	১০৯
জৈনধর্মের প্রাণশক্তি	.....	১১৭
ভারতীয় মধ্যযুগে শূন্যবাদ ঃ ইহার অর্থ ও ক্রমবিকাশের ধারা	.....	১২৯
ভক্ত দাদূ ও আকবর সংবাদ	.....	১৪৭
সাধনায় বীরত্ব	.....	১৫৩
শিখদের মহাগ্রন্থ	.....	১৫৯
ঝাড়খণ্ডে কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রভাব	.....	১৬৫
'সাধু-সন্ত'	.....	১৭৪
মধ্যযুগে সহজ ও সেবা	.....	১৮২
মীরার গান ও বসন্তোৎসব	.....	১৯৪
সন্তমত ও মানব-যোগ	.....	২০৯
সাধক ও সম্প্রদায়	.....	২২৯
মুসলমান ভক্তের বসন্তোৎসব	.....	২৩৯
যোগী কবীর	.....	২৫৪
বর্তমান জগদ্ব্যাপী দুর্গতি	.....	২৬২
জাপ ও জপমালা	.....	২৬৬
শ্রীগুরু নানক জন্মোৎসব	.....	২৬৯

দোল-দুলাল শ্রীচৈতন্য ২৭৩
গতির মুক্তি ২৮৬
সাধক ভীখার নবজীবন ২৯১
ভক্ত রবিদাস ২৯৫
ভক্ত নারী দয়াবাঈ ৩০৭
ভক্ত কুম্ভনদাসজি ৩০৯
বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ৩১৪
কবীরের গুরুবন্দনা ৩১৭
ভক্ত চোখামেলার দোল-উৎসব ৩২১
সিন্ধুদেশের সুফি গুরু শাহ লতিফ ৩২৬
মধ্যযুগের ভক্ত চরণদাসজি ৩৩৩
দুঃখী ভক্ত শ্রীধর ৩৩৮
নববর্ষ ও সাধনার মালা ৩৪১
ধর্মের অপমান ৩৪৭
ভক্তদের বর্ষা ঋতু ৩৫০
ভক্ত সাধকের বিশ্বযোগ ৩৬১
প্রেমের নির্মলতা ৩৬৬
ঋষি সাধকের বসন্ত উৎসব ৩৭২
ভক্তকবি কবীর ৩৭৬
মহাকবি সূরদাস ৩৮৩
ভক্ত রবিদাসের বসন্তোৎসব ৩৮৮
সীমা ও অনন্ত ৩৯৪
বিশ্ব ছন্দলীলা ৩৯৮
মীরার জীবনসংগীত ৪০২
নির্দেশিকা ৪০৭

কবীরের রামায়ণ

গভীর রাত্রি, আমার বহুদিনের একটি পরিচিত স্বর শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া অমনি গবাক্ষের পার্শ্বে আসিয়া বসিলাম। সেই অন্ধ সাধু — যিনি গভীর রাত্রিতে নির্জনে কবীরের সংগীতে কতদিন আমার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে প্রশান্ত করিয়াছেন, সেই প্রেমিক নির্লোভ অন্ধ সাধু। তিনি গাহিতে লাগিলেন কবীরের রামায়ণ। সেই কবি ও ভক্ত, সেই বিচিত্র ধর্মের মধ্যে ঐক্যের দ্রষ্টা, বিচিত্র ঘটনার মধ্যে এক সত্যের আবিষ্কর্তা, সেই নিগূঢ় তত্ত্বের ঋষি, রামায়ণ কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে অপূর্ব সত্য লাভ করিয়া যে গান গাহিয়া উঠিয়াছেন — সেই গান গাহিতে লাগিলেন। সীতার মধ্যে কবি ভক্তকে, আপনাকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং রামের মধ্যে ভজনীয়কে দেখিতে পাইয়াছেন। তাই কবীর গাহিতেছেন :

'আমি যখন জন্মলাভ করিলাম সকলে জানিল আমি আমার জনকের গৃহেই জন্মিয়াছি। জনক আমার তত্ত্বদর্শী, তিনি বুঝিলেন আমি বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহার গৃহে আসিয়াছি — তিনি আমাকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন।

'অনাদি বলিয়া জানিলেও আমাকে তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন। বড়ো হইলাম — পিতা মনস্থ করিলেন আমাকে মহতের কাছে উৎসর্গ করিবেন। একটি পরীক্ষা জগতের সম্মুখে ধরিলেন — দেবসাধ্য মহাসত্ত্ব সে পরীক্ষা। পৃথিবীর বহু বলী হারিয়া গেল। বহুদিন যায় — সকলে নিরাশ হইতেছেন — আমার পিতা নিরাশ হয়েন নাই। একদিন হঠাৎ আমার দেবতা আমার দুয়ারে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। কিন্তু আমাকে গ্রহণ করিতে হইলে একটি বিষম কার্য করা চাই। আমাদের বংশে যে দেবতার দত্ত একটি ধন আছে তাহা অহংকারে ঋজু হইয়া আছে — তাহাকে ধনুর ন্যায় বিনয়নম্র করিলে তবেই সে কার্যোপযোগী হইতে পারে। সেই অনমনীয় দণ্ডটুকু ত্রিপুরারিকর্তৃক দত্ত বলিয়া তাহার প্রতিকারও হওয়া সম্ভব হয় নাই। পার্থিব কোনো বল তাহাকে নত করিতে পারে নাই — সে আমার দেবতারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। অথচ আমি সে প্রতীক্ষার কিছুই জানিতাম না। আমি তখন প্রস্তুতই ছিলাম না — কিন্তু তিনি তথাপি সেই পরীক্ষা পার হইয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিলাম না — কিন্তু তিনি আমাকে অন্বেষণ করিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার সমৃদ্ধ রাজ্যে লইয়া চলিলেন; পথে (পরশুরামের) সদম্ভবীর্য আমার পথ রোধ করিলে তিনি বীর্যবলে তাহা মুক্ত করিলেন। অযোধ্যার রাজগৃহে আমি গেলাম, এখন আমি তাঁহার সুখের সহচরী হইলাম। তিনি ও আমি সমৃদ্ধির নব নব সুখ ভোগ করিতে লাগিলাম।

'সমৃদ্ধির দিন ফুরাইল। আমাকে এই রাজপুরী ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে অরণ্যে বাহির হইতে হইল। কিন্তু সঙ্গে আছেন তিনি, আমার আনন্দের সীমা নাই। তিনি দরিদ্রের বেশে যখন বাহির হইলেন তখন দেখিলাম তিনি পতিত ও দরিদ্রকে (গুহক) আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অযোধ্যায় তাঁহার এই মূর্তি দেখি নাই। অরণ্যে আছি — আনন্দে আছি, কারণ সাথে সাথে তিনি আছেন। সন্তোষে আমার আনন্দ প্রতিদিন প্রগাঢ় হইতেছিল।